The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXXV, No. 1, pp 79-98, ISSN 2306-3920

পূর্ববাংলায় নগরায়ণ (১৯৪৭-১৯৫৩) : প্রেক্ষাপট, গতি ও প্রকৃতি

সাজেদা বেগম*

[**সার-সংক্ষেপ :** পূর্ববাংলার নগরায়ণের ইতিহাসে ১৯৪৭ সাল গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচনার দাবী রাখে। দেশভাগের পরে ভারত থেকে আগত মুসলমান অভিবাসী ও গ্রাম থেকে শহরে জনসাধারণের স্থানান্তরের কারণে পূর্ববাংলার নগরায়ণের দ্রুত বিকাশ ঘটে। নগরায়ণের এই দ্রুত বিকাশে যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা, কর্মসংস্থানের সুযোগ, শিল্প কারখানা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি স্থাপন করা জরুরি হয়ে পড়ে যা নগরায়নের সমস্যা ও সম্ভাবনা তৈরি করে। পূর্ববাংলার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নগর সংক্রান্ত বিভিন্ন আলোচনা থাকলেও দেশভাগ পরবর্তী নগর সম্প্রসারণে সরকারের ভূমিকা কী ছিল এবং নগরায়ণ এ অঞ্চলের মানুষের উপর কতটুকু প্রভাব ফেলেছিল সে সম্পর্কে কোনো গবেষণা লক্ষ করা যায় না। তাই বর্তমান প্রবন্ধে নগরায়ণের গতি-প্রকৃতি আলোচনার পাশাপাশি ১৯৪৭-১৯৫৩ সময়কালে পূর্ববাংলার নগরায়ণে সরকারি পদক্ষেপ ও জনজীবনে এর ফলাফল গুরুত্বের সাথে পর্যালোচনা করা হয়েছে।]

মূল শব্দ : পূর্ববাংলা, নগরায়ণ, গতিধারা, সরকারি নীতি, প্রভাব

১. ভূমিকা

প্রাচীন বাংলায় বিচ্ছিন্নভাবে ছোট ছোট সমৃদ্ধ নগর ব্যবস্থা গড়ে উঠলেও পূর্ববাংলায় আধুনিক নগরায়ণের উন্মেষ ঘটে মূলত আঠারো শতকে। এর আগে এই অঞ্চলে বড় ধরনের শহর ও নগর গড়ে না উঠলেও ঢাকা ছিল ব্যতিক্রম। মুঘল শাসনের সুবাদে ঢাকা নগর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল। ঢাকা ছিল পূর্ববাংলায় নগরায়ণ ও নাগরিক জীবনের এক নতুন রূপ। ঢাকার এই নগরায়ণ তথা অর্থনৈতিক উন্নতিতে কারিগর, শিল্পী, বণিক, শ্রমিক ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাদের অধিকাংশই বস্ত্রশিল্পের সাথে জড়িত ছিল। উনিশ শতকে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী বড় বড় শহরগুলো বিভিন্ন সেবামূলক কাজ ও নতুন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সূচনা করে। শিক্ষা ও জনকল্যাণমূলক কাজে সরকারের আগ্রহ বৃদ্ধির সাথে সাথে শহরগুলিও নতুন ভূমিকা পালন করে। বিশ শতকের শুরুর দিকে অধিকাংশ শহর নিজেদের অর্থনৈতিক ভিত্তি স্থাপনে সক্ষম হয়। ১৯২০ সালের মধ্যেই বাংলার শহর ও নগরের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং ১৯২১-১৯৩১ সময়কালে গ্রামের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে নগরায়ণ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। দেশভাগের পর ভারত থেকে মুসলমানদের অভিবাসনের ফলে পূর্ববাংলায় নগরায়ণের গতি বৃদ্ধি পায়। তবে এ পর্যায়ে পাকিস্তানের সকল নীতি ও সিদ্ধান্ত পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাস্তবায়ন করায় অল্প সময়ের মধ্যে এ গতি মন্থর হয়ে পড়ে। সরকারি বিনিয়োগ কম থাকায় পূর্ববাংলার শিল্পের উন্নয়ন ব্যাহত হয় এবং এ

* **সাজেদা বেগম :** সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

অঞ্চল কৃষিনির্ভর হয়ে পড়ে যা নগরায়ণের প্রক্রিয়াকে মন্থর করে দেয়। অবশ্য এর পরেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে পূর্ববাংলায় নতুন নতুন শহরের উদ্ভব হয়। যেসকল স্থানে শিল্প ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বেশি ছিল সেসকল স্থান বিশেষ করে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী প্রভৃতি স্থানে হাজার হাজার মানুষ গ্রাম থেকে শহরে আসে। দ্রুত নগরায়ণের ফলে সৃষ্টি হয় নতুন নতুন কর্মসংস্থান ও ব্যবসা বাণিজ্যের। এতে নাগরিক জীবনের প্রক্রিয়া সচল থাকে।

পূর্ববাংলার নগরায়ণে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে যা নগরের বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। কিন্তু এসকল পদক্ষেপ জনসাধারণের নগর সমস্যা সমাধানে পর্যাপ্ত ছিল না। নগরায়ণের কারণে একদিকে যেমন শহরগুলোতে বস্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পায় তেমনি অন্যদিকে কর্মসংস্থানের অভাব, পর্যাপ্ত আর্থিক সুযোগ-সুবিধার অভাব প্রভৃতি দেখা দেয়। ফলে নগরকেন্দ্রগুলোতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। আবার শহরে অভিবাসনের ফলে গ্রামাঞ্চলে কৃষি শ্রমিকের অভাবসহ সাধারণ জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি কমে যাওয়ায় ব্যাহত হয় পূর্ববাংলার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। এতে যে বাস্তবতা তৈরি হয় তা এতদ্ অঞ্চলের নগর ও নাগরিক জীবনে বিপুল প্রভাব রাখে। ফলে পূর্ববাংলার সমাজ-সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা ও সম্ভাবনা তৈরি হয়। যা দ্রুত মানুষকে অধিকারবোধ, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার তথা স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে। অবশ্য এতদ্ সত্ত্বেও এ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা-বিশ্লেষণ লক্ষ করা যায় না। এ বিবেচনা থেকেই বর্তমান প্রবন্ধটি রচনা করা হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে গুরুত্বের সাথে পর্যালোচনা করা হয়েছে দেশভাগের অব্যবহিত পরের পূর্ববাংলার নগরায়ণের প্রেক্ষাপটসহ গতি-প্রকৃতি।।

এই প্রবন্ধে দুই ধরনের তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য হিসেবে ১৯৪৭ সাল পরবর্তী বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা বিশেষ করে *দৈনিক আজাদ*, *দি ডন*, এবং বিভিন্ন আরকাইভাল তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। আরকাইভাল তথ্যের মধ্যে বিভিন্ন গেজেট, গেজেটিয়ার, সরকারি আদেশ-প্রজ্ঞাপন, জেলা পর্যায়ের রেকর্ড প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের তথ্য হিসেবে প্রকাশিত বিভিন্ন পুস্তক আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে।

২. ১৯৪৭ পরবর্তী নগরায়ণের গতিধারা

১৯৪৭ সালের দেশভাগজনিত অভিবাসন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বিভিন্ন শহরের বৃদ্ধি প্রভৃতির মাধ্যমে নগরায়ণের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে। নগরগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে নগরের আয়তন ও সীমানাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে শহরের সীমানা বেড়ে গিয়ে গ্রামীণ এলাকায় শহরের সম্প্রসারণ ঘটে। গ্রামাঞ্চলে শিল্পগত ও বিভিন্ন কারিগরি কাজের উন্নয়ন ঘটলে সেখানে জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। কেননা, লোকজন জীবিকার প্রয়োজনে সমৃদ্ধ এলাকায় বসতি গড়তে থাকে (আফরোজ, ২০১৯ : ২৬)। তাই বর্ধিত জনসংখ্যার বাসস্থানসহ অন্যান্য চাহিদা পূরণে বিভিন্ন নাগরিক সুযোগ-সুবিধার প্রয়োজন দেখা দেয়। দেশভাগের পর জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও বসতি, শিল্পকারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রভৃতি আলোচনার মাধ্যমে পূর্ববাংলার নগরায়ণের গতিধারা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২.১ জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও বসতি স্থাপন

১৯৪৭ সালের দেশভাগের সময় পূর্ববাংলায় আধুনিক নগর তো দূরের কথা বড় ধরনের কোনো নগরও ছিল না। ব্রিটিশ শাসকদের প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক প্রয়োজনের কারণে কয়েকটি বিভাগীয়, জেলা ও মহকুমা শহর, একটি সমুদ্র বন্দর (চট্টগ্রাম) ও কয়েকটি নদী বন্দর থাকলেও কোনো শিল্প শহর ছিল না। তবে অন্যান্য শহরের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বড় শহর ছিল ঢাকা। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর ঢাকা শহর একটি মফঃস্বল শহর থেকে মেট্রোপলিটন নগরে পরিণত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। কারণ

দেশভাগের পর ঢাকা পূর্ববাংলার রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি পায় এবং বিত্তবান ও মধ্যবিত্তশ্রেণির জনসাধারণের ব্যাপকভাবে আগমন ঘটতে থাকে। ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে শুরু করে বিভিন্ন সরকারি প্রয়োজনে ধীরে ধীরে উন্নত হতে থাকে শহরটি (আলী, ১৯৯৩ : ১৮১)। রাজধানীর মর্যাদা লাভের পর এখানে নতুন নতুন দালান-কোঠা প্রতিষ্ঠা লাভ করতে থাকে। সরকারি কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য বিভিন্ন অফিস আদালত, কর্মচারীদের বাসস্থান, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন বাড়ি, স্কুল-কলেজ, ছাত্র-ছাত্রীদের বাসস্থানসহ বিভিন্ন কাজের জন্য বহু বাড়ির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় (*দৈনিক আজাদ*, ১৩৫৬)।

পূর্ববাংলা হিন্দু জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপদ না হওয়ায় তারাও ভারতে চলে যেতে থাকে। অন্যদিকে মুসলমানরা তাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে পূর্ববাংলায় চলে আসতে থাকে এবং বসতি স্থাপন করে। ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে চট্টগ্রাম শহরাঞ্চলের লোকসংখ্যা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। কারণ ভারত থেকে আগত হাজার হাজার মুসলমান জনসাধারণ শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল চট্টগ্রামে। ১৯৫১ সালের পর থেকে ভারত ও পাকিস্তানের সব এলাকা থেকে শরণার্থী, মুসলমান ব্যবসায়ী, শিল্পপতি বিভিন্ন কর্মচারী এবং শ্রমিকশ্রেণি ব্যাপকভাবে চট্টগ্রাম শহরে আসতে থাকে। ফলে এই জেলার শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি ঘটতে থাকে। ব্রিটিশ আমল থেকে চট্টগ্রামের যেসকল পরিবার ব্যবসা ও অন্যান্য কাজের জন্য বার্মায় কর্মরত ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তারাও ফিরে আসতে থাকে চট্টগ্রামে। ফলে দেখা যায় যে, ১৯৫১ সালের মধ্যে চট্টগ্রাম নগরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৩,৭২,৬৩২ জন। জেলার মোট জনসংখ্যার হার ১২.৫% হলেও নগরায়ণের ক্ষেত্রে এই হার হয় ২৫.৯৫%। পরবর্তী দশকে এই জনসংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। মূলত পৌর এলাকার ভিত্তিতে চট্টগ্রামের লোকসংখ্যা ছিল বেশি (ভূইয়া, ২০১৯ : ২৩৩-২৩৫)।

চট্টগ্রাম জেলার অপর একটি শহর ছিল মহকুমা শহর কক্সবাজার। কক্সবাজার প্রথমদিকে একটি বাজার হিসেবে পরিচিত ছিল কিন্তু পরবর্তী সময়ে এটি শহরে পরিণত হয়। কক্সবাজার শহরটি সমুদ্র সৈকতের সন্নিকটে হওয়ায় এই শহরের বিকাশ ঘটেছিল পর্যটকদের আসা-যাওয়াকে কেন্দ্র করে। আবার মহকুমা প্রশাসনের সদর দফতর এখানে থাকায় শহরটির প্রশাসনিক গুরুত্বও ছিল। তবে দেশভাগের আগে এ শহরের তেমন বিকাশ লক্ষ করা না গেলেও ১৯৪৭ সালের পরে জনসংখ্যা বৃদ্ধিসহ নগরায়ণের গতি লক্ষ করা যায় (ভূইয়া, ২০১৯ : ২৩৩-২৩৫)।

রাজশাহী জেলার জনসংখ্যার পরিবর্তনের সাথে সাথে সম্পত্তির মালিকানারও পরিবর্তন ঘটে। ১৯৪৭ সালেই বিভাগীয় অফিস স্থানান্তরিত হয় জলপাইগুড়ি থেকে রাজশাহীতে। শহরটিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি অফিস-আদালত, ইনস্টিটিউট, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হতে থাকে। এর ফলে বিভিন্ন পেশার সাথে যুক্ত বিপুল জনসাধারণ শহরে বসতি গড়ে তোলে এবং বিস্তৃত হতে থাকে বিভাগীয় শহর রাজশাহী (রহমান, ২০১২ : ৪৯৬-৪৯৭)। দেশভাগ এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে পূর্ববাংলার দিনাজপুর জেলার জনসংখ্যা অনেক কমে যায়। তবে জেলা সদর হবার কারণে পূর্ববাংলার দিনাজপুর নগরের প্রতি লোকজনদের আকর্ষণ বেশি কাজ করেছে। ১৯৫০ এর দশকে দিনাজপুর নগরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে যার অন্যতম কারণ ছিল দেশভাগ ও নানামুখী পরিবর্তন। ভারত থেকে মুসলমানদের আগমনের কারণে পরবর্তী বছরগুলোতে জনসংখ্যা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। ফলে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে এ জেলার অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যায় (খুদা ও মাহবুব, ১৯৯৬ : ৪১৭-৪১৯)।

পূর্ববাংলায় অভিবাসীদের জন্য এবং সরকারি বিভিন্ন কর্মচারী ও বণিকশ্রেণিদের জন্য নতুন নতুন বাসস্থান ও গৃহ নির্মাণ করা হয়। যেমন সরকারের দাপ্তরিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রথমে রমনা এলাকায় সরকারি ভবন তৈরি করা হয়। এরপর আজিমপুর পলাশী ব্যারাক (সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী সময়ে ইংরেজদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত), ঢাকেশ্বরী প্রভৃতি এলাকায় বসবাস তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯৪৭

পরবর্তী সময়ে 'নতুন ঢাকা' সৃষ্টি করতে রমনার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল ব্যবহার করা হয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা বিস্তারের জন্য সম্পূর্ণ নীলক্ষেত এলাকা ও শাহাবাগের কিছু অংশ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। খেলাধূলা বিষয়ক কর্মকান্ডের জন্য নবাবপুর থেকে পুরানা পল্টন পর্যন্ত খোলা জায়গায় একটি স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হয় যা বর্তমানে বঙ্গবন্ধু ন্যাশনাল স্টেডিয়াম নামে পরিচিত। রাজারবাগ এলাকায় পুলিশ ও ডাকঘর কর্মীদের জন্য বাসস্থান গড়ে তোলা হয়। শান্তিনগর, সিদ্ধেশ্বরী, কাকরাইল ও কমলাপুর এলাকায় আবাসন গড়ে তোলা হয়। ১৯৫৩ সালের পর থেকে ধানমন্ডি, মিরপুর, মোহাম্মদপুর এলাকাকে আবাসিক এলাকা হিসেবে গড়ে তোলা হয়। এসকল কর্মসূচির ফলে ঢাকা শহর জনবহুল নগরীতে পরিণত হয় (ঘোষাল, ২০১২ : ৬৫, ৬৬)।

১৯৫২ সালে দিনাজপুর পৌরসভার নির্বাচন হয় এবং এই শহরের নানমুখী উন্নয়ন কর্মকান্ড ঘটতে থাকে। শহরকেন্দ্রিক জীবনের প্রবণতা বেড়ে যাওয়ায় দিনাজপুর শহরে বিভিন্ন ধরনের ইমারত তৈরি হতে থাকে। গ্রামাঞ্চলের জোতদারশ্রেণি উন্নত সংস্কৃতি ও রুচিবোধের সান্নিধ্যে এসে শহরমুখী জীবনযাপনের জন্য পাকা দালান-কোঠা তৈরি করতে থাকে। তাছাড়া ষাটের দশকের বন্যায় দিনাজপুর শহরের কাঁচা বাড়িঘর নষ্ট হয়ে গেলে লোকজন পরবর্তীতে ইট, সিমেন্ট দ্বারা বাড়িঘর তৈরি করতে আগ্রহী হয়। ফলে সামর্থ্য অনুযায়ী লোকজন তাদের বাড়িঘর নির্মাণ করতে থাকে যা নগরের সমৃদ্ধি ঘটায় (আহমদ, ১৯৯৬ : ৪২৫)।

দেশভাগের পর অন্যান্য শহরের নগরায়ণ প্রক্রিয়া যেভাবে বেড়েছে সিলেট শহরে তা সম্ভব হয়নি। কারণ দেশভাগের আগে সিলেট জেলার সাথে পশ্চিম বাংলার কুচবিহার, পাটনা, কোলকাতার বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। কিন্তু দেশভাগের পর সিলেট পূর্ববাংলায় এবং এর বেশিরভাগ পশ্চাদভূমি ভারতে পড়ায় শহরটি তার গুরুত্ব হারাতে থাকে। ফলে ১৯৪৭ পরবর্তী সময়ে (বিশ শতকের ষাটের দশক পর্যন্ত) নগরটি সকল দিক থেকে একটি স্থবির নগর হিসেবে পরিচালিত হতে থাকে (ইসলাম, ১৯৯৯ : ৬৩৪)।

২.২ শিল্প কারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্য

দেশভাগের পরে পূর্ববাংলা পেয়েছিল ৯০টি সুতার কল, ১০টি চিনি কল, ৩টি সিমেন্ট কারখানা। পরবর্তীতে এই শিল্প কারখানাগুলোকে কেন্দ্র করে পূর্ববাংলার আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন ঘটে এবং নগরায়ণের ধারা লক্ষ করা যায় (আফরোজ, ২০১৯ : ২৬)। ১৯৪৭ সালের পর পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী দেশসমূহের পরামর্শ ও সহায়তায় শিল্পায়ন, বিকেন্দ্রীকরণ এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন কেন্দ্র প্রভৃতির বিস্তার ঘটে। এরই ধারাবাহিকতায় চট্টগ্রাম, সিলেট এবং খুলনাতেও ১৯৫০ এর দশকে বিভিন্ন শিল্পকারখানা গড়ে উঠতে থাকে। ফলে শহরগুলো ব্যাপকভাবে বিকাশ লাভ করতে থাকে (মামুন, ২০০৪ : ২০৫)। মোটামুটি প্রত্যেক শহরের প্রধান রাস্তার পাশে এই শিল্পগুলো গড়ে তোলা হয়। পুরাতন শহরের এই শিল্প সম্প্রসারণের প্রক্রিয়াটি মধ্যবিত্ত আবাসিক এলাকার পরিবর্তন ঘটিয়ে শিল্প এলাকাকে সমৃদ্ধ করেছিল। তবে নতুন শহর ও নগরগুলোতে এই পদ্ধতি খুব বেশি শক্তিশালী ছিল না। পাশাপাশি উন্নত আবাসিক এলাকাগুলো তাদের আবাসন এলাকা ব্যবহারের প্রাধান্য বজায় রেখেছিল। তাই আলোচ্য পর্বে শিল্পের সম্প্রসারণ খুব বেশি ঘটে নাই (Islam, 1996 : 36)। তাছাড়া এই অগ্রগতি সাধনে যে গুরুত্বপূর্ণ নীতি ও সিদ্ধান্তের প্রয়োজন ছিল তার সবটাই পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ দ্বারা। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন থেকে শুরু করে সার্বিক সম্পদ বণ্টন পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি পক্ষপাতিত্বের কারণে বঞ্চিত হয়েছে পূর্ববাংলা। আবার ভারি শিল্পকারখানা এবং সরকারি বিনিয়োগ সকল কিছুই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানকেন্দ্রিক। তাই শিল্পের উৎপাদন যথেষ্ট না হওয়ায় পূর্ববাংলা কৃষিকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। বাণিজ্যিক ও শিল্প খাতের উন্নয়নেও পিছনে পড়ে এ অঞ্চল (আহমেদ, ১৯৯৩ : ১৩১)।

পাকিস্তান আমলে শিল্প গড়ে ওঠার মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটে। ফলে ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ও উন্নয়ন ঘটতে থাকে। খুচরা ব্যবসার সম্প্রসারণ হতে থাকে এবং এই ব্যবসা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৫৩ সালের আজিমপুরে নিউ মার্কেট নামে বিরাট আধুনিক মার্কেট (বিপণিবিতান) সম্প্রসারিত স্থাপিত হয়। খুচরা বিক্রয় ময়মনসিংহ, এয়ারপোর্ট ও মিরপুর রোডে বিস্তৃত হতে থাকে। মূলত এই বাজার বা বিপণি কেন্দ্রগুলো নতুন নতুন শহরের প্রধান প্রধান রাস্তায় সাড়িবদ্ধভাবে গড়ে উঠতে থাকে (রব্বানী, ২০১২ : ৩৮-৩৯)। তেজগাঁও শিল্প এলাকাকে সরকার অধীনে নিয়ে আসা হয়। মতিঝিল এলাকা আগে নির্জন থাকলেও ১৯৫৩-৫৪ সালের মধ্যে এখানে বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হয় (ঘোষাল, ২০১২ : ৬৫, ৬৬)।

দেশভাগের পর পূর্ববাংলার প্রধান বন্দর হিসেবে চট্টগ্রামের গুরুত্ব ব্যাপক ভাবে বেড়ে যায়। পাকিস্তান রাষ্ট্রে আমদানি-রপ্তানির পুরোটাই সম্পন্ন হতো চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে। ফলে চট্টগ্রামের গুরুত্ব বৃদ্ধির সাথে সাথে শহরের লোকসংখ্যাও ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। কারণ ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা, এবং চাকুরিজীবিদের সংখ্যা ও অবস্থান শহরেই বেশি ছিল। পূর্ববাংলার প্রায় সকল জেলা থেকেই আগত বহু শ্রমিক-কর্মচারী চট্টগ্রামের বিভিন্ন শিল্পকারখানাগুলোতে চাকুরি নেয় এবং এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। কারণ ততোদিনে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে চট্টগ্রামের গুরুত্ব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। আর শিল্পায়ন ও বন্দরের উপযোগিতা বৃদ্ধির কারণে এ শহরের নগরায়ণ দ্রুতহারে বৃদ্ধি পেয়েছে (ভূইয়া, ২০১৯ : ২৪০-২৪১)।

পাট রপ্তানি করে এবং বিভিন্ন জুট মিল, কাগজ তৈরির কারখানা, হার্ড বোর্ড মিল, শিপইয়ার্ড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে খুলনা নগরীর অনেক উন্নতি হয়। বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠায় এখানকার কৃষি অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ে। ১৯৫১ সালের পরে এসে খুলনা শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়। এই নগরীর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ১৯৫১ সাল থেকে বৃদ্ধি পেতে থাকে। মূলত দেশভাগের পর যেসকল লোক ভারত থেকে এদেশে এসেছিল সেসকল অবাঙালি লোকেরাই খুলনার শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিতে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল। আর স্থানীয় লোকেরা ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে শুরু করে উদ্যোক্তা এবং পুঁজি সকল ক্ষেত্রেই অনেক বেশি পিছিয়ে ছিল (Chaudhury and Hassan, 1999 : 89-90)।

দিনাজপুর মূলত একটি কৃষিভিত্তিক নগর। এখানে ছিল বিশাল পশ্চাদভূমি। তাই জনগণ আশা করেছিল জেলাটি শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করবে। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। প্রশাসনিক ও জেলাসদর হিসেবে শহরের উন্নয়ন হলেও শিল্প ও বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে এর গুরুত্ব একেবারে অনেক কম ছিল। পরবর্তী সময়ে এখানে শিল্প বাণিজ্যের সামান্য উন্নয়ন ঘটলেও যান্ত্রিক পরিবহণের যথেষ্ট অভাব থাকায় এক্ষেত্রে খুব বেশি অগ্রগতি লাভ করা সম্ভব হয়নি (খুদা ও মাহবুব, ১৯৯৬ : ৪২১)।

২.৩ যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

একটি নগরের মান নির্ভর করে এর সড়ক ব্যবস্থা তথা যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর। তাই নগর পরিকল্পনায় পরিকল্পিত যোগাযোগ ব্যবস্থাকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়। নগরের সড়ক ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য থাকে নগরের বিভিন্ন স্থানের মধ্যে মানুষ ও পণ্য পরিবহণের সুবিধা প্রদান করা (মারুফা, ২০০২ : ১৭১)।

নগরগুলোতে নতুন নতুন রাস্তা তৈরি আর পুরাতন রাস্তাগুলোকে ক্রমাগত প্রশস্ত করা হয় যানবাহনের অসুবিধা দূর করার জন্য। নগরায়ণের ফলে সমগ্র বাংলার বিভিন্ন শহরে বাড়ি-ঘর তৈরি করা হয় এবং প্রত্যেকটি জেলা সদরকে পাকা রাস্তার মাধ্যমে ঢাকার সাথে যুক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় (আহ্মদ, ১৩৮৩ : ১৫৭)। দেশভাগের পর পূর্ববাংলার ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা জরুরি ছিল। তাই নতুন নতুন রাস্তাঘাটের প্রয়োজনীয়তা বেড়ে

যায়। ১৯৫০ এর দশকের দিকে জিন্নাহ এভিনিউ থেকে বিমান বন্দর পর্যন্ত দুই লেন বিশিষ্ট রাস্তা নির্মাণ করা হয় (ঘোষাল, ২০১২ : ৬৫, ৬৬)।

পাকিস্তানের যোগাযোগ সচিব জনাব সরদার বাহাদুর খান বলেন, "দেশভাগের পর চট্টগ্রাম বন্দরের অনেক উন্নয়ন ঘটেছে। দেশভাগের আগে চট্টগ্রাম বন্দরে মাত্র ৪টি জাহাজ নোঙ্গর করতে পারতো। কিন্তু এখন বিশেষ করে ১৯৫০ সালে এসে একসাথে ১১টি জাহাজ একসাথে নোঙ্গর করতে সক্ষম হয়। এই বন্দরে বর্তমানে বছরে ১২ লক্ষ টন মালামাল আমদানি ও রপ্তানি করার সক্ষমতা অর্জন করেছে" (*দৈনিক আজাদ*, ১৯৫০ : ১)। এসকল উন্নয়নমূলক কাজের মধ্য দিয়ে চট্টগ্রামের সাথে বিভিন্ন জেলার যোগাযোগ তৈরি হয় এবং নগর হিসেবে চট্টগ্রাম উন্নতির দিকে যেতে থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, দেশভাগের পর বাণিজ্যিক ও শিল্পকেন্দ্র হিসেবে চট্টগ্রাম জেলা গুরুত্ব ব্যাপকভবে বেড়ে যায়। সেই সাথে বহু লোকের বসতিও স্থাপিত হয়। দিনাজপুর জেলার সড়কপথের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেলেও পরিবহণ ব্যবস্থা খুব বেশি বিকশিত হয়নি। এখানে পরিবহণের অন্যতম মাধ্যম ছিলো রিক্সা এবং গরুর গাড়ি (ষাটের দশকের শেষ পর্যন্ত)। তবে এখানকার বাসগুলো শহরের বাইরে যাতায়াতের জন্য বেশি ব্যবহৃত হতো বলে নগরের অভ্যন্তরে বাস চলাচল খুব একটা ছিল না। মূলত উন্নত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি নগরে বিভিন্ন আবাসন প্রকল্প, বাণিজ্যিক ও শিল্পকারখানা গড়ে ওঠে। কিন্তু দেশভাগ পরবর্তী সময়েও দিনাজপুরে এ ধরনের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় এখানে নগরায়ণের ধারা ছিল অত্যন্ত ধীর গতির (খুদা ও মাহবুব, ১৯৯৬ : ৪১৭-৪১৯)।

২.৪ শিক্ষা

নগরায়ণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো শিক্ষা। বিভিন্ন নগরের শিক্ষক ও সকল স্তরের মানুষের মধ্যে একটি নতুন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সূচনা করে এই শিক্ষার বিকাশ। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে পূর্ববাংলা খুব বেশি অগ্রগতি লাভ করতে পারেনি।

সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার পাশাপাশি এদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করবে বলে আশা করা হয়েছিল। কিন্তু দেখা যায় যে, সরকার নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা না করে প্রাথমিক বিদ্যালয় বাতিল করার ব্যবস্থা করেছে। দেশভাগ পরবর্তী ৬ থেকে ৭ বছরে পূর্ববাংলা হতে ২ হাজারের বেশি প্রাথমিক বিদ্যালয় উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ এসময়কালে পশ্চিম পাকিস্তানে স্থাপন করা হয়েছে ৬ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় (*Assembly Proceedings*, 1956 : 215)। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সময় পূর্ববাংলা মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এগিয়ে থাকলেও পরবর্তীতে সেই উন্নতি ব্যাহত হতে থাকে। কেন্দ্রীয় সরকার মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতিতে পশ্চিম পাকিস্তানে নতুন নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিলেও পূর্ববাংলার ক্ষেত্রে তা ছিল অনুপস্থিত। ১৯৫১ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত সমগ্র পাকিস্তানে বালকদের জন্য ১৫৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হলেও পূর্ববাংলা পেয়েছিল মাত্র ১টি। বালিকাদের ৭৯টি বিদ্যালয়ের ৭৮টিই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। অর্থাৎ মোট ৩২৪টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয় যার প্রায় সবগুলোই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে (খাতুন, ২০২০ : ৭০-৭১)। তবে সরকার পূর্ববাংলার রংপুর এবং শেরপুর জেলায় দুটি কৃষি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিল। প্রথম ৫ বছরে পাঁচটি ধান গবেষণা কেন্দ্রে ৫ মিলিয়ন রূপি বরাদ্দ দেওয়া হয়। ময়মনসিংহ জেলায় পশুদের চিকিৎসার জন্য বিশেষ করে খামার পশু চিকিৎসার জন্য একটি পশু চিকিৎসার কলেজ স্থাপন করা হয়। আবার ময়মনসিংহে একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনেরও পরিকল্পনা করা হয় (Umar, 2004 : 349)।

১৯৪৭ সালের পর রাজশাহী ভারতের সীমান্তবর্তী গুরুত্বপূর্ণ শহর হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। রাজশাহী শহরটি পূর্ববাংলায় বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছিল রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী সিটি কলেজ, উইমেন্স কলেজ, সরকারি ইন্টারমেডিয়েট কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হওয়ার মাধ্যমে। শিক্ষা অর্জনের জন্য জনসাধারণের শহরমুখী হওয়ার

প্রবণতা দেখা দেয়। ফলে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে নগরীর সম্প্রসারণ ঘটতে থাকে (ভূইয়া, ২০১৯ : ২৪৬)।

দেশভাগের পর বহু উর্দুভাষী রিফিউজী মুসলমান ভারত থেকে এসে উত্তরবঙ্গে বসতি স্থাপন করে। রাজশাহীর বিরাট অঞ্চলে বসতি স্থাপনের মাধ্যমে তাদের দ্বারা এখানে গড়ে উঠেছিল একটি উর্দুভাষী উপশহর। ঘনবসতিপূর্ণ এবং কৃষি সমৃদ্ধ এলাকা হিসেবে পরিচিত হলেও শিক্ষা নগরী হিসেবে এই শহরের ব্যাপক জনপ্রিয়তা রয়েছে। তাই এই অভিবাসী জনগোষ্ঠীসহ রাজশাহীর বিশাল জনগোষ্ঠীর উচ্চশিক্ষার চাহিদা পূরণে এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় জরুরি ছিল। কারণ পূর্ববাংলার জনসাধারণের উচ্চশিক্ষা প্রসারে এ অঞ্চলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। তাই উত্তরাঞ্চলের মানুষের দাবির প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে ১৯৫২-৫৩ সালের বাজেটে দেশের দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ১০ লক্ষ টাকার প্রকল্প গ্রহণ করা হয় এবং এটি পূর্ববাংলার রাজশাহী জেলায় স্থাপনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় (বানু, ২০১০ : ১১২)। ১৯৫৩ সালে ৩১ মার্চ পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদে পাস হয় The Rajshahi University Act 1953 (East Bengal Act xv of 1953) নামক বিলটি। ৬ জুলাই ১৯৫৩ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হওয়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৫৩-৫৪ শিক্ষাবর্ষে পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্স খোলার মাধ্যমে একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয় (*The Dhaka Gazette*, 1953 : 1)। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঠিকই কিন্তু এর গঠন প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য কি হবে তা নিয়ে কোনো পরিকল্পনা করা হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেক্ষাপটে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে বা শিক্ষার্থীদের কল্যাণে কোনটি তাৎপর্যপূণ তা বিবেচনা না করেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুসরণ করে তাদের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকে। ফলে নানারকম জটিলতা সৃষ্টি হয়। দেশভাগের পর ১০ বছর অতিবাহিত হলেও এই দীর্ঘ সময়ে আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ববাংলায় প্রতিষ্ঠা হয়নি। শিক্ষা তথা উচ্চশিক্ষার ব্যাপক চাহিদা থাকা সত্ত্বেও সরকার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তেমন কোনো মনোযোগ দেয়নি (সিদ্দিকী, ২০০০ : ১১৫)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আলোচ্য সময়কালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল মাত্র ২টি। এসময় শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছুটা উন্নতি এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও তা সন্তোষজনক ছিল না। কারণ সে তুলনায় সরকারি সাহায্য বা বাজেট বরাদ্দ থাকতো অনেক কম। ফলে শিক্ষা প্রসারে বাঁধা সৃষ্টি হয় যার ক্ষতিকর প্রভাব জনজীবনে প্রতিফলিত হয় (Dhaka *Govt. of Pakistan*,1968 : 131,180- 186)।

চট্টগ্রাম জেলার উন্নতিতেও শিক্ষার প্রসার জরুরি ছিল। তাই ১৯৫৩ সালে এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি করা হয়। মূলত পূর্ববাংলা সরকার চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে দুটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য আইন পাস করলেও সরকার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব বাদ দিয়ে দেয়। শহর থেকে দূরে এবং রাজনৈতিক সংকট থেকে মুক্ত করতে এই বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার কথা থাকলেও দীর্ঘদিন তা প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। সরকার এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনে অর্থ বরাদ্দ দিতে সম্মতও ছিল। তা সত্ত্বেও যথাসময়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। শিক্ষা একটি নগরীর উন্নতিতে কতটা জরুরি তা জানা সত্ত্বেও সরকার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় কালক্ষেপণ করতে থাকে (পরবর্তীতে জনসাধারণের চাহিদার প্রেক্ষাপটে ১৯৬৬ সালে গিয়ে চট্টগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়) (*Govt. of East Bengal*, 1953)। চট্টগ্রামে একটি মেডিকেল কলেজ তৈরি করা হলেও ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত এখানে কোনো ক্লাস শুরু হয়নি। এখানকার সরকারি হাসপাতালের অবস্থা আরও ভয়াবহ ছিল। বহু রোগী কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে গেলেও তারা সেখানে সুচিকিৎসা তো দূরের কথা কোনো বিছানা পর্যন্ত পায়নি। অথচ হাসপাতালের সংস্কার ও উন্নয়নে সরকার ছিল উদাসীন। ফলে দেখা যায় আলোচ্য সময়কালে চট্টগ্রাম নগরীতে শিক্ষার উন্নতি খুব বেশি হয়নি (*Assembly Proceedings,* 1956 : 199)।

পূর্ববাংলার নগরায়ণ প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এখানকার নগরায়ণের গতি ছিল অত্যন্ত কম। কারণ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির দেশ পূর্ববাংলা অর্থনৈতিকভাবে অনেকটা ভঙ্গুর ছিল। তাই এখানে নগরায়ণের গতি কম হবে এটাই স্বাভাবিক। বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত পূর্ববাংলার জনসাধারণের গ্রামীণ জীবনে অভ্যস্ত থাকার কারণে নগরায়ণ প্রক্রিয়া খুব বেশি বৃদ্ধি পায়নি। বিশ শতকের চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের নানারকম ঘটনাবলী যেমন মহামন্দা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, ১৯৪৭ এর দেশ বিভাগ প্রভৃতি কারণে পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত পূর্ববাংলার নগরায়ণের ধারায় তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটে নাই। আবার জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি, এপার-ওপার যাতায়াত প্রভৃতি কারণেও ব্যাহত হয়েছে নগরায়ণ প্রক্রিয়া। তবে ১৯৫১ সালের দিকে নগরায়ণের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪.১২ শতাংশ। এরপর নগরায়ণের বৃদ্ধির এই ধারা অব্যাহত থাকে এবং পূর্ববাংলার নগরায়ণ দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে (রহমান, ২০০৬ : ৮২)। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে পূর্ববাংলার নগরায়ণের গতিধারা উল্লেখ করা হলো-

চিত্র : পূর্ববাংলা বা বাংলাদেশের নগরায়ণের ধারা

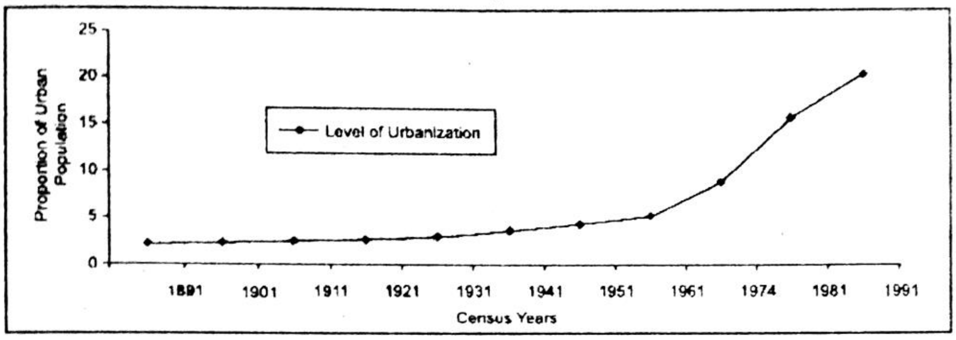

(**উৎস :** আব্দুর রহমান, *নগর পরিচিতি ও পরিকল্পনা*, ২০০৬, পৃ. ৮৩।)

আবার নগরের সংখ্যার ক্ষেত্রেও ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। ১৯৪১ সালে নগরের সংখ্যা হয় ৫৯টি। ১৯৫১ সালে গিয়ে পূর্ববাংলার নগরের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৬৩টি। অর্থাৎ দেশভাগ পরবর্তী সময়ে অভিবাসন বৃদ্ধির কারণে জনসংখ্যা বেড়ে যায় এবং বর্ধিত জনসংখ্যার বাসস্থান ও অন্যান্য নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধি করতে নগরের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকে (রহমান, ২০০৬ : ৮৩)। পূর্ববাংলার ঢাকা বিভাগে নগরায়ণের হার ছিল সবচেয়ে বেশি। আর রাজশাহী বিভাগের নগরায়ণ ঢাকার চেয়ে কম হলেও চট্টগ্রাম বিভাগের তুলনায় বেশি ছিল। নিচে সারণিতে দেওয়া হলো-

বিভাগের নাম	মোট জনসংখ্যার মধ্যে শহরবাসীদের হার
বর্ধমান	৬.৬
প্রেসিডেন্সি	১৬.২
রাজশাহী	১.৮
ঢাকা	২.৭
চট্টগ্রাম	১.৭

(**সূত্র :** ভূইয়া, ২০১৯ : ২৪৫)।

ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের নগর প্রক্রিয়ায় উন্নয়ন দেখা গেলেও পূর্ববাংলায় তা ছিল একেবারে নগণ্য। তাই এখানকার নগরায়ণের গতিও ছিল অত্যন্ত ধীর। বিশেষ করে কিছু কিছু জেলা যেমন নেত্রকোনা, সাতক্ষীরা, গোপালগঞ্জ, নওগাঁ, জয়পুরহাট, ঠাকুরগাঁও, গাইবান্ধা, মৌলভীবাজার প্রভৃতিতে নগরায়ণের মাত্রা ছিল একেবারে কম। তবে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, দিনাজপুর, সিলেট, খুলনা, পাবনা, চুয়াডাঙ্গা এসব শহরে নগরায়ণ বিস্তৃতি ছিল বেশি (নগরায়ণ, বাংলাপিডিয়া, ২০১৫)।

৩. নগর উন্নয়নে সরকারি পদক্ষেপ

দেশভাগ পরবর্তী পূর্ববাংলা নগর সম্প্রসারণে সরকারকে ব্যস্ত সময় পার করতে হয়েছে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর যে পরিমাণ জনগোষ্ঠী পূর্ববাংলা ত্যাগ করে ভারতে চলে যায় তার চেয়ে মুসলমান অভিবাসীরা খুব কমই এসেছে পূর্ববাংলায়। আর যারা এসেছিল তাদের অধিকাংশই হিন্দুদের ছেড়ে যাওয়া সম্পত্তি ও বাড়িঘর দখল করতে সক্ষম হয়েছিল। অবস্থাসম্পন্ন হিন্দুদের বাড়িগুলোতে মুসলমানদের পুনর্বাসনের ফলে পাকিস্তান সরকারের উপর পুনর্বসতি নিয়ে চাপ কিছুটা কম ছিল বলেও ধারণা করা হয়। তাই দীর্ঘমেয়াদী রিফিউজি ক্যাম্প পূর্ববাংলায় খুব বেশি দেখা যায় না (সাহা, ২০২১ : ১৩৭)। তবুও ভারত থেকে আগত লোকদের পুনর্বাসনের জন্য সরকারকে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়েছে।

যেসকল জনগোষ্ঠী এদেশে এসেছিল তাদের অর্থাৎ মোহাজেরদের বসবাসের জন্য পাকিস্তান সরকার বেশ কিছু প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো গড়ে তোলে। এর মধ্যে অন্যতম ছিল গৃহ নির্মাণ ঋণদানের জন্য রিফিউজি রিহেবিলিটেশন ফাইন্যান্স কর্পোরেশন, হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (এইচবিএফসি) এবং আবাসিক এলাকার উন্নয়নের জন্য গৃহ সংস্থান পরিদপ্তর (আহমদ, ১৯৯৬ : ৪২৪)।

কিন্তু গ্রাম ও শহরাঞ্চলের বাসস্থান বা প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের উপর তেমন কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। বিশাল পরিমাণ জনগোষ্ঠীর বাসস্থানের প্রয়োজন দেখা দিলেও নতুন বাসস্থান তৈরিতে অনেক সময় লেগেছে। যেখানে জরুরি ভিত্তিতে জনসাধারণের সমন্বয় সাধনের দরকার ছিল সেখানে তা করা সম্ভব হয়নি। তাই ১৯৪৮ সালের দিকে পুরাতন শহর এলাকাগুলোতে বিদ্যমান পুরাতন বাড়িঘরগুলো বিভাজনের মাধ্যমে সমন্বয়ের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এসকল কর্মকান্ড যথেষ্ট ছিল না। পরবর্তীকালে নতুন শহরের খোলা জায়গায় বাড়িঘর নির্মাণ ও বৃদ্ধি করে সংকট নিরসনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় (Islam, 1996 : 17)।

তবে অপরিকল্পিত গৃহ নির্মাণ ও পুকুর খনন বন্ধ করার জন্য সরকার ১৯৫১ সালে 'পূর্ববঙ্গ গৃহ নির্মাণ অর্ডিন্যান্স ১৯৫১' নামে একটি অর্ডিন্যান্স জারি করে। এলামেলো ও পরিকল্পনাহীনভাবে গৃহ নির্মাণ ও পুকুর খননের ফলে প্রদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা কাজে যাতে জটিলতা সৃষ্টি না হয় সেজন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরে এই অর্ডিন্যান্স কার্যকর করা হয়। পরবর্তীতে এই অর্ডিন্যান্সের ফলে 'পূর্ববঙ্গ গৃহ নির্মাণ আইন ১৯৫২' প্রবর্তন করা হয়। এই আইন লঙ্ঘন করে বা সংশ্লিষ্ট অফিসারদের অনুমতি ব্যতীত কেউ যদি বাড়ি বা পুকুর খনন করে তবে তা দন্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে। এর জন্য ৫০০ টাকা জরিমানা এবং ৬ মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদন্ডও দেওয়া হবে। ফলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, কেউ যদি স্থায়ীভাবে কোনোকিছু নির্মাণ বা স্থাপন করতে চায় তাহলে তাকে এর পূর্বে সংশ্লিষ্ট অফিসারদের অনুমতি নিতে হবে (*দৈনিক আজাদ*, ১৯৫৩ : ৩)। নগরায়ণে আর একটি বড় বাঁধা ছিল সরকারের রিকিউজিশন নীতি। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট প্রভৃতি শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন বাড়ি রিকুইজিশন করে সরকারি অফিস কিংবা সামরিক ব্যারাকে পরিণত করে নগরের সম্প্রসারণ বাধাগ্রস্ত করে সরকার (দাস, ১৯৮৯ : ৪০)। সরকারি কাজের জন্য কুষ্টিয়া মহকুমা সদরের কয়েকটি বাড়ি অধিগ্রহণ করেছিল সরকার। ফলে এখানকার জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা বেড়ে যায়। পরে এখানে বাড়ি তৈরি করার জন্য অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হলেও শেষ পর্যন্ত বাড়ি তৈরি করা

হয়নি। দেশভাগের পর ভারত থেকে আগত প্রায় ২ লক্ষ অভিবাসী এখানে আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু তাদের পুনর্বাসনের জন্য সরকার তেমন কার্যকরী কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি (বাহার, ২০১৫ : ৩৭৫-৩৭৬)।

১৯৪৭-৪৮ সালে পূর্ববাংলার বিভিন্ন নগরে যে অভিবাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল তাদের অন্যান্য নাগরিক চাহিদার সাথে পরিবহণ চাহিদাও পূরণ করতে হয়েছে। আর এই চাহিদা পূরণ করতে সৃষ্টি হয়েছে নানামুখী সমস্যার। মূলত নগর বৃদ্ধির সাথে সাথে যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিসীমাও বেড়ে যায়। শহরাঞ্চলের রাস্তাঘাট সংক্রান্ত দায়িত্ব দেওয়া হয় পূর্ত বিভাগের উপর। বলা হয় যে, সরকারি রাস্তাগুলোর সাথে শহরের যেসকল রাস্তাঘাট সংযুক্ত রয়েছে সেগুলো পূর্ত বিভাগই রক্ষণাবেক্ষণ করবে। সম্ভব হলে এই বিভাগ মিউনিসিপ্যালিটিকে রাস্তা নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন পাথরের লুড়ি, খোয়া ইত্যাদি সরবরাহ করবে (*দৈনিক আজাদ*, ১৯৫২ : ১)। কিন্তু নগরায়ণের সাথে পরিবহণ ব্যবস্থার সমস্যা দেখা দেয়। যেসকল নগরের জনসংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে সেখানে এই সমস্যা বেশি হয়। আবার অর্থনৈতিক উন্নতি-অবনতির সাথে নগরের পরিবহণ সমস্যার সম্পর্ক বিদ্যমান। শহরাঞ্চলে পরিবহণ ব্যবস্থার মূল সমস্যা হলো যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক বিভিন্ন ধরনের যানবাহনের সংমিশ্রণ। আলোচ্য সময়কালে পূর্ববাংলার বিভিন্ন নগরে যাতায়াতের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে রিক্সা, ভ্যান, সাইকেল, ঠেলা গাড়ি, গরু ও ঘোড়ার গাড়ি ইত্যাদি। নগরায়ণ বৃদ্ধির সাথে সাথে এসকল উপাদানও বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু পরিবহণ আইন ও বিধানগুলো ঠিকমতো না মেনে পরিবহণ পরিচালনার কারণে বিভিন্ন সমস্যায় পড়েছে নগরবাসী। নগরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় নগরবাসীর জীবনযাত্রার উন্নতি বিধানে এসময় বিভিন্ন দালান-কোঠা, স্কুল-কলেজ স্থাপন এবং খাদ্যসামগ্রী সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাই রড, সিমেন্ট, বালি প্রভৃতি সকল কাঁচামাল পরিবহণের জন্য উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রয়োজন পড়েছে। নগরের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করতে অনেক সময় বিভিন্ন রাস্তাঘাট বন্ধ করে কাজ পরিচালনা করা হয়েছে। এজন্য যানজট দেখা গেছে মারাত্মকভাবে। আবার পার্কিং অসুবিধা, গণপরিবহণের ভিড় প্রভৃতি কারণে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তাতে নগরবাসীদের নানারকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে (রুমী ও হক, ২০০৫ : ২৫৫-২৫৬)।

রাস্তাঘাটের অবস্থা খারাপ থাকায় চলাফেরা করতে ব্যাপক সমস্যা হয়েছে। রাস্তাঘাট ঠিক করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও সরকারি দলাদলির কারণে কোনো উন্নয়ন কাজই সময়মতো সম্পন্ন করা হতো না (*Assembly Proceedings*, 1956 : 208-209)। সরকার পূর্ববাংলার ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা প্রভৃতি শহরের জন্য প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণের জন্য একটি দশশালা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। মোট চল্লিশ কোটি টাকা ব্যয় করে কাঁচা পাকা রাস্তা তৈরি ও পুরাতন রাস্তাও মেরামত করা হবে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়। প্রদেশের রাস্তাঘাটের উন্নতি অর্থাৎ একটি সুপরিকল্পিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য একটি পরিকল্পনা এবং অর্থও বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু রাস্তা নির্মাণ বিশেষজ্ঞরা মন্তব্য করেন যে, পূর্ববাংলার রাস্তাঘাটগুলো নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মাণ করা হয় নাই। এলোমেলো ও বিচ্ছিন্নভাবে নির্মাণ করার ফলে এই প্রদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব কখনই পূরণ হয়নি। পূর্ববাংলা সরকারের যোগাযোগ বিভাগ ১৯৪৮-৪৯ এবং ১৯৪৯-১৯৫০ সালে মোট ৬৭৬ মাইল রাস্তা নির্মাণ ও উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কিন্তু দুই বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও এই উন্নয়ন কাজে সফলতা আসে নাই। কারণ রাস্তা নির্মাণের যন্ত্রপাতির যথেষ্ট অভাব ছিল। বলা হয় যে, এই দশশালা পরিকল্পনাকে সফল করতে বা বাস্তব রূপ দিতে হলে প্রতিবছর কমপক্ষে ২৫ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে হবে। কিন্তু তা না করায় উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যাহত হয়েছে (*দৈনিক আজাদ*, ১৯৫০ : ১)।

মেহেরপুর থেকে কুষ্টিয়া যাওয়ার জন্য যে রাস্তার কাজ শুরু হয়েছিল তা ছিল অত্যন্ত ধীর গতির। আবার রাস্তাটি কাঁচা হবে নাকি পাকা হবে তা নিয়েও সমস্যা সৃষ্টি হয়। চাঁদপুর বন্দর থেকে

চট্টগ্রাম পর্যন্ত যে খালটি ছিল তা খনন করে জলপথ তৈরি করা (নাব্য করা) এবং চাঁদপুর থেকে কুমিল্লা পর্যন্ত রাস্তা পাকা করার পরিকল্পনা থাকলেও তা দীর্ঘদিন পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা হয়নি। রাস্তাঘাটের এই খারাপ অবস্থা এবং সুষ্ঠু যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকার কারণে বার বার ব্যাহত হয়েছে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ (বাহার, ২০১৫ : ৩৭৫-৩৭৬)।

দেশভাগের পর পূর্ববাংলার রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা দারুণভাবে ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু কয়লার অভাব এবং বড় ধরনের কোনো রেল কারখানা না থাকায় পূর্ববাংলার রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার কোনো উন্নতি হয় নাই। দীর্ঘদিন অর্থাৎ আরও ৩-৪ বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত রেল চলাচল ব্যবস্থার উন্নতি দেশভাগ পূর্বের সময়ের মতো হবে না বলে জানান পূর্ববাংলার অর্থ, রাজস্ব, বাণিজ্য ও শিল্পসচিব জনাব হামিদুল হক চৌধুরী (*দৈনিক আজাদ*, ১৯৪৮ : ১)। তাই পরবর্তী সময়ে নতুন রেললাইন স্থাপন এবং যুদ্ধের সময় যেসকল রেললাইন উঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেগুলোর মেরামতের জন্য সরকার অর্থ বরাদ্দ দেয় আড়াই কোটি টাকা। এর পুরোটাই পূর্ববাংলা উন্নয়নে ব্যয় করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৬ সাল অর্থাৎ আগামী ছয় বছরের মধ্যে রেলওয়ে যানবাহনের উন্নয়ন ও রেলরাস্তা সম্প্রসারণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বলা হয় যে, খুব শীঘ্রই আমপুরা-চাপাইনবাবগঞ্জ রেললাইন এবং শায়েস্তাবাদ-হবিগঞ্জ রেললাইন পুনরায় চালু করা হবে। আবার কয়েকটি স্থানে নতুন নতুন রেললাইন স্থাপনের জন্য জরিপ কাজও সম্পন্ন করা হয়েছে। একাজের জন্য সরকার বিদেশ থেকে ১০০টি নতুন মালগাড়ি, ২০০টি নতুন ইঞ্জিন এবং ৩০০টি যাত্রীবাহী গাড়ি আমদানী করবেন বলে জানানো হয় (*দৈনিক আজাদ*, ১৩৫৭ : ৫)। কিন্তু এই রেললাইনকেও অবৈধ কাজে ব্যবহার করেছে অসাধু ব্যবসায়ী ও চোরাকারবারিরা। তারা রেলযোগে খুলনা চট্টগ্রামসহ পূর্ববাংলার বিভিন্ন এলাকায় চোরাকারবার করতো যার ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে নগরায়ণের উপর (*দৈনিক আজাদ*, ১৯৫৩)।

পূর্ববাংলার প্রাদেশিক সরকার প্রদেশের বৈদ্যুতিক উন্নয়নসহ বেশকিছু উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ঋণ চেয়েছিল। রাস্তাঘাট, বিদ্যুতায়ন, নির্দিষ্ট শিল্প, সেচের জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয়, কৃষি যন্ত্রপাতি প্রভৃতির জন্য চাওয়া হয়েছিল ১৭ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকার এর মধ্যে অনুমোদন দিয়েছিল মাত্র ৪ কোটি টাকা এবং এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ছিল রাস্তাঘাট, মাটি কাটার জন্য ড্রেজার ক্রয়, হাইড্রো এবং থার্মোবিদ্যুৎ। কিন্তু এই অর্থ কিভাবে ব্যয় করা হবে সে সম্পর্কে কোনো দিক নির্দেশনা ছিল না। এই ঋণের উপর একটি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় যে, কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা যে প্রকল্প স্পষ্টভাবে অনুমোদিত হয়নি সে প্রকল্পে এই অর্থ ব্যয় করা যাবে না। একে তো উন্নতির জন্য অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হতো কম তার উপর আবার বিভিন্ন শর্ত যোগ করে দেওয়ায় নগরায়ণ প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়েছে (*Assembly Proceedings*, 1949 : 71)। বিশ্বের সর্বত্রই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের একটি কার্যকরী বাহন হলো নগরায়ণ। যদিও উন্নয়নশীল দেশে নগরায়ণের হার কম তবুও জাতীয় অর্থনীতিতে এর তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রয়েছে। কিন্তু দেশভাগের পর নানা কারণে পূর্ববাংলার নগরায়ণ ধীর গতিতে হয় এবং এর বহুমুখী প্রভাব জনজীবনে পরিলক্ষিত হয়।

দেশভাগের পরবর্তী ৫/৬ বছর পরেও সমগ্র পূর্ববাংলার রাস্তাঘাট ও পানি-বিদ্যুৎ সরবরাহে যে অচলাবস্থা ছিল সরকার তা দূর করতে সমর্থ্য হয়নি। আবার খাদ্য সমস্যা ছিল পূর্ববাংলার একটি বিরাট সমস্যা এবং এ সমস্যার কারণে প্রতি বছর প্রায় ৩০ কোটি টাকার খাদ্যশস্য কিনতে হয়। এ সমস্যা নিমূল করতে সরকার মনোযোগ দিতে পারেনি বা কঠিন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। গ্রামীণ এলাকায় টিউবওয়েল যথেষ্ট না থাকায় এখানে পানির সংকট ছিল ব্যাপক। গ্রামের মেয়েরা প্রায় দুই মাইল দূর থেকে কলসি ভরে পানি নিয়ে আসতো। এই সমস্যা বিবেচনায় যেসকল টিউবওয়েল দেওয়া হয়েছিল তাও ছিল অবস্থাসম্পন্ন লোকদের বাড়ির সন্নিকটে। আবার টিউবওয়েল খারাপ হলে এগুলো মেরামতেরও যথেষ্ট ব্যবস্থা ছিল না (বাহার, ২০১৫ : ৩৭৬)।

মূলত পাকিস্তান সৃষ্টির শুরু থেকেই পূর্ববাংলা কৃষি, শিল্প, নগরায়ণ প্রভৃতি দিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে অনেক পিছিয়ে ছিল। এখানে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের কোনো মাধ্যম ছিল না। যেকোনো ধরনের সমস্যা সমাধান বা প্রয়োজন মেটাতে হলে নির্ভর করতে হয় পশ্চিম পাকিস্তানের উপর। বন্যা, খরা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ নানা কারণে পূর্ববাংলায় সবসময় খাদ্য ঘাটতি ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। জনসাধারণের সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানে প্রাদেশিক সরকার তেমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই। আবার কেন্দ্রীয় সরকারও এসব বিষয়ে ছিল উদাসীন। ফলে জনমনে বিরূপ প্রভাব লক্ষ্য করা যায় (রহমান ও আজাদ, ১৯৯০ : ১৩২)।

৪. পূর্ববাংলায় নগরায়ণের আর্থ-সামাজিক প্রভাব

পূর্ববাংলার আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নগরায়ণের প্রভাব ছিল ব্যাপক। নগর সম্প্রসারণের ফলে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিক থেকেই নানারকম প্রভাব প্রতিফলিত হয়। ১৯৪৭ সালের পর থেকে পূর্ববাংলার শহুরে সমাজ ব্যাপকভাবে সম্পসারিত হতে থাকে এবং সমাজকাঠামোতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। এসময় বিভিন্ন কারণে পূর্ববাংলার নগরায়ণ ধীর গতিতে হলেও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে এখানকার শহরগুলো ঘনবসতিপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে। এ অঞ্চলের পূর্বের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা তাদের সকল দায়িত্ব ও প্রভাব ছেড়ে দেয় বাঙালি মুসলমান সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণিভূক্ত আইনজীবী ও পেশাজীবীশ্রেণির নিকট। ফলে দেশভাগের পর দ্রুত সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম কেন্দ্র হয়ে ওঠে শহরগুলো। মধ্যবিত্তশ্রেণি পরবর্তীতে প্রদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে যা সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে (সেন, ২০০৬ : ১১৬)।

নগরায়ণ ও অভিবাসনের ফলে সবচেয়ে বেশি প্রভাব দেখা যায় রাজধানী শহর ঢাকাতে। রাজধানীকে কেন্দ্র করে সকল সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে গ্রাম ও শহরের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য সৃষ্টি হয় এবং গ্রামের জনসাধারণ শহরের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়ে এখানে বসতি গড়ে তোলে। ১৯৫১ সালে গিয়ে ঢাকা শহরের জনসংখ্যা দাঁড়ায় ৩৩৬,০০০ জন যা ১৯৪৭ সালে ছিল ২৫০,০০০ জন। আর পূর্ববাংলার মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৫১ সালে হয় ১৮,৩০,০০০ জন বা বৃদ্ধিতে ১৮.৩৮ শতাংশ যা দেশভাগের পূর্বে ছিল ১৫,৪০,০০০ জন বা ৪৩.২০ শতাংশ (ঘোষাল, ২০১২ : ৬৯)। ফলে দেখা যায় যে, দেশভাগের পর ঢাকা শহরের জনসংখ্যা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। জীবনযাত্রার মান উন্নত করার বিভিন্ন উপাদান যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য, নির্মাণ শিল্প, প্রশাসনিক কাজকর্মে অংগ্রহণের সুযোগ, অভিবাসীদের ব্যাপকহারে আগমন বৃদ্ধি পাওয়ায় শহরের উপর চাপ সৃষ্টি হয়। এছাড়া উন্নত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, উন্নত সড়কপথ, পৌর সুবিধা প্রভৃতি বৃদ্ধি পাওয়ায় শহরের ব্যাপক সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটে (ঘোষাল, ২০১২ : ৬৯)।

দেশভাগের পর ভারত থেকে আগত মুসলমানদের অধিকাংশই বসতি গড়ে তুলেছিল ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের শহরগুলিতে। ঢাকার ধানমন্ডির উত্তরে মোহাম্মদপুর হাউজিং সোসাইটি ও মিরপুর এলাকা পুনর্বাসনের জন্য ব্যবহৃত হওয়ায় বর্ধিত জনগোষ্ঠীর বাসস্থানসহ নানারকম নাগরিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। তবে আগে থেকেই যারা এসব এলাকায় বসবাস করে আসছিল তাদের সাথে খাপ খেয়ে চলতে জীবনযাত্রার বিভিন্ন বিষয়ে তাদের অসুবিধায় পড়তে হয়েছে (*ঢাকা জেলা গেজেটিয়ার*, ২৭৩)। উন্নত এলাকাগুলোতে বাড়ির ভাড়া বেড়ে যায়। যেমন ঢাকার ধানমন্ডি এলাকার বাড়িগুলো বছরে যে পরিমাণ বাড়ি ভাড়া আয় করত অন্য কোনো এলাকায় তেমনটা ছিল না। এর অন্যতম কারণ ছিল অভিবাসী জনগোষ্ঠীদের ধানমন্ডি এলাকার আশেপাশে এবং মোহাম্মদপুর এলাকায় বসতি স্থাপন (Islam, 1996 : 20-22)। সরকার শরণার্থী জনগণের পুনর্বাসনের জন্যই কতগুলো শিল্প ও বাণিজ্যনীতি গ্রহণ করে যার কারণে এই জনসাধারণও শহরে বসবাসে বেশি আগ্রহী ছিল। পরবর্তীতে এই অবাঙালি শ্রেণিই

সমাজের অত্যন্ত প্রভাবশালী শ্রেণিতে পরিণত হয় এবং বাঙালি মুসলিম সমাজে বিকাশ ঘটে একটি অবাঙালি মুসলিম বুর্জোয়াশ্রেণির (সেন, ২০০৬ : ১১৬)।

তবে এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশের শহর ও নগর উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বার বার বাধা সৃষ্টি করেছে। ফলে গ্রামের মানুষ গ্রামে কোনো কর্মসংস্থানের সুযোগ না পাওয়ায় চলে এসেছে শহরে। কিন্তু বর্ধিত জনসংখ্যার সাথে তাল মিলিয়ে কলকারখানা বা তাদের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়নি। ফলে বেকার সমস্যাসহ নানামুখী সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে (আহমেদ, ১৯৯৩ : ১৩৪)। বস্তি এলাকাগুলোর উন্নতি ও প্রসার ঘটতে থাকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে। তেজগাঁও ও তার পাশ্ববর্তী এলাকায় এবং রেললাইনের আশেপাশে অল্প জায়গার ব্যবধানে বস্তিগুলো গড়ে ওঠে। বস্তির এসকল জায়গা দখল করে রেখেছিল অর্থাৎ বস্তিগুলোতে বাস করতো দিনমজুর, মালবাহী বিভিন্ন গাড়ির চালক, রিক্সা চালক এবং ভিক্ষুকশ্রেণি। নতুন শহর বা নগরের মৃৎশিল্পগুলোও দখল করে রেখেছিল এই নিম্নশ্রেণির লোকেরা। বিশেষ করে ঢাকা জেলার রায়ের বাজার এলাকা ছিল তাদের দখলে। আবার কারওয়ান বাজারে বিভিন্ন শিল্পকারখানার শ্রমিকরা বসবাস করতো। ১৯৪৭ সালের পর খুব কমসংখ্যক লোকই পুরাতন শহরগুলোতে থেকেছে। নগরায়ণ বৃদ্ধির সাথে সাথে সকলে চলে এসেছে নতুন নগরীতে (Islam, 1996 : 19-20)। আবার আর্থিক দুর্দশাগ্রস্ত গ্রামগুলোতে চুরি-ডাকাতি বৃদ্ধি পাওয়ায় লোকজন তাদের পরিবারকে শহরে নিয়ে এসেছে। গ্রামীণ জমির উপর আগ্রহ কমে যাওয়ায় এবং শহরগুলোতে কারখানা শ্রমিকদের আয় নিশ্চিত হওয়ায় জনগণের মধ্যে নগরমুখী হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে (আহ্মদ, ১৩৮৩ : ১৫৭)।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ববাংলার ভূমিগুলোতে দ্রুত পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। অভিবাসীদের বাসস্থানসহ গ্রাম ও অন্যান্য স্থান থেকে আগত লোকদের বাসস্থানের চাহিদা মেটাতে গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবাসিক এলাকাগুলো তাদের মর্যাদা হারাতে থাকে। জমির ভাড়া, জনসংখ্যার ঘনত্ব, আবাসন প্রকল্পের উপর চাপ, বিদ্যুৎ, পানি-গ্যাসের ব্যবহার, টেলিফোন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রভৃতি কারণে উন্নত এলাকাগুলোতে বাড়ি ভাড়া বেড়ে যায়। স্টেডিয়াম, ক্রীড়া ক্লাবসহ বিনোদনের ব্যবস্থা করতে যেসকল জমি ব্যবহার করা হয়েছে তার মূল্যও ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে (ইসলাম ও বাকী, ১৯৯৬ : ১৮)। নগরের সংখ্যা যতো বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে ভূমির মূল্যও ততোটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। ঢাকা চট্টগ্রামসহ পূর্ববাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ১৯৪৭ পরবর্তী সময়ে ভূমির চাহিদা ও মূল্য ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। এর অন্যতম কারণ হলো শহর-নগরের উন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য উপযুক্ত ভূমির চাহিদা বৃদ্ধি। সেই ভূমিতে গড়ে ওঠে খনি শিল্প, কলকারখানা, অফিস-আদালত প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান। আবার বর্ধিত জনসংখ্যার বাসস্থানের চাহিদা পূরণেও ভূমির মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে যা জনজীবনে সমস্যা সৃষ্টি করেছে। তবে নগরে যাদের নিজস্ব জমি বা ভূমি ছিল তাদের এক ধরনের সামাজিক মর্যাদা ছিল আর যাদের নেই তাদের ছিল অন্যরকম মর্যাদা। অর্থাৎ ভূমি সামাজিক মানদন্ড নির্ধারণ করতো। আবার পূর্ববাংলার নগরগুলোতে এমন কিছু লোকের বসবাস ছিল যারা নগরকে কেবল কাজের স্থান হিসেবে বিবেচনা করে। তাই নগরে ভূমি কিনে নিজেদের অবস্থান পরিবর্তনের কোনো প্রবণতা খুব একটা দেখা যায় না (Islam, 1996 : 19-20)। এতে নগরের দারিদ্রের অনুপাত এবং দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি শহর ও শিল্প-এলাকাগুলোতে গ্রামের লোকের সংখ্যা অবিরত বৃদ্ধি পায় (আহ্মদ, ১৩৮৩ : ১৫৭)।

নগরায়ণের ফলে গ্রামের লোকজন উন্নত জীবনের আশায় শহর বা নগরে চলে এসেছে ঠিকই কিন্তু নগরের এই বর্ধিত জনসংখ্যার বাসস্থানসহ অন্যান্য আর্থ-সামাজিক চাহিদা পূরণ ও দারিদ্র বিমোচন করা কঠিন হয়ে পড়েছে। এসকল সমস্যার সমাধানে সরকার বা স্থানীয় নগর কর্তৃপক্ষ সক্ষম ছিল না। আবার পর্যাপ্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন কর্মী তৈরিতে সরকারি সাহায্যের পরিমাণ ছিল অপর্যাপ্ত। সরকারি খাতগুলো বর্ধিত জনগোষ্ঠীর বেকার সমস্যা সমাধানে

চাকুরির চাহিদা মেটাতে সক্ষম ছিল না। ফলে দেখা যায় যে, ঢাকা ও চট্টগ্রামের মতো জেলায় ধনীশ্রেণির চাহিদা পূরণে যেমন পুকুর, জলাধার ও পাহাড়ের উপর চাপ সৃষ্টি হয় তেমনি স্বল্প আয়ের লোকেরা তাদের বাসস্থানের চাহিদা পূরণে অত্যন্ত নিম্নমানের বস্তি নির্মাণ করতে বাধ্য হয়। এরূপ নগরায়ণের ফলে সমাজে নানামুখী পরিবর্তন লক্ষ করা যায় (নগরায়ণ, বাংলাপিডিয়া, 2015)।

নগরের আকার যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশ সেভাবে বৃদ্ধি পায় নাই। সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকশের সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কোনো সামঞ্জস্য না থাকায় জনসংখ্যা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায় যা বাসস্থানের ক্ষেত্রে সংকট সৃষ্টি করে। ফলে নগরের অধিকাংশ লোক ভাড়া বাড়িতে অথবা বস্তিতে বসবাস করেছে এবং অনেকে এক কক্ষ বিশিষ্ট বাড়িতেও বসবাস করেছে। নগরের এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব গ্রামীণ এলাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। এর ফলে ব্যাহত হয়েছে গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নতি। তবে নগরগুলোতে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি, যাতায়াত-যোগাযোগ ব্যবস্থার বিকাশ, শিক্ষা, চিকিৎসা, কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রভৃতি কারণে যখন গ্রামাঞ্চলের লোকেরা শহরে যায় তখন গ্রামে কৃষি শ্রমিকদের অভাব দেখা দেয়। তা সত্ত্বেও গ্রাম থেকে শহরে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের সরবরাহ কমে নাই। নগরের এসকল চাহিদা পূরণে আবার নতুন করে গ্রামে কৃষি ব্যবস্থার সূচনা হয় যা অর্থনৈতিক উন্নতির পথ প্রশস্ত করে (মারুফা, ২০০২ : ৫০, ৫৬)। নগরের সকল ব্যক্তির নিজস্ব বাড়িঘর থাকে না। তাই সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা ও স্থানীয় বাসিন্দাদের বাড়ি ভাড়া নিয়ে নগরে বসতি স্থাপন করে গ্রাম বা নগরীর বাইরে থেকে আসা লোকজন। আবার গৃহহীন অবস্থায় অনেক লোক ফুটপাত, রেলস্টেশন, বাসস্ট্যান্ড প্রভৃতি স্থানে বসবাস করে। উন্নত জীবনযাপনের আশায় অনেক সময় বস্তি ভেঙ্গে ফেলা হয় এবং নগরের পুরাতন দালানকোঠা ভেঙ্গে নতুনভাবে নগরের সমৃদ্ধি ঘটানো হয়। অনেক লোক গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসে যার কারণে তাদের পারিবারিক বন্ধন ভেঙ্গে পড়ে। ফলে দেখা যায় যে, একজন নাগরিকের বাসস্থান, পরিবহণ, আর্থিক স্বচ্ছলতা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, বিনোদন প্রভৃতি কর্মকান্ডের সাথে নগর সমস্যা বিশেষভাবে জড়িত (রহমান, ২০০৬ : ২৯১)। আবার শহরের জনসংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে বাসস্থান, কর্মসংস্থানসহ অন্যান্য নাগরিক সুবিধা সেভাবে বৃদ্ধি পায়নি। তাই স্বাস্থ্য সমস্যাসহ নানারকম নাগরিক সমস্যায় পতিত হয়েছে নগরের জীবন। বিশুদ্ধ খাবার পানি ব্যবহারের অভাবে দূষিত পানির ব্যবহার, আবাসন সমস্যা সমাধানে খাল, বিল, পুকুর ভরাট করে অবৈধ ও অপরিকল্পিত বাড়িঘর ও স্থাপনা তৈরি করা হয়। ফলে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থায় বাধা সৃষ্টি হয় যা নগরগুলোতে সমস্যা সৃষ্টি করে (ইলাহী ও রুমী, ২০০৫ : ৩৯০)।

পূর্ববাংলায় শিল্পায়ন দ্রুত গতিতে আরম্ভ হলে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন দেখা যায়। ভূমিহীন ও দিনমজুর জনগোষ্ঠী ঢাকা, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, খুলনা এবং অন্যান্য কয়েকটি শিল্প এলাকায় এসে ভীড় জমাতে থাকে। গ্রামবাসীরা কেবল কলকারখানাগুলোতে নয় নতুন শহর ও নগরগুলোতেও কাজ করার করার সুযোগ পায় (আহ্মদ, ১৩৮৩ : ১৫৭)।

১৯৪৭ পরবর্তী সময়ে শিল্পায়ন ও নগরায়ণ প্রক্রিয়া ব্যাপকভাবে অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি করেছিল। তবে অর্থনৈতিক উন্নতি এবং নগরায়ণ বৃদ্ধির সাথে সাথে নগরগলোতে কিছু অসাধু ব্যবসায়ীদের অস্তিত্ব দেখা যায়। এরা চোরাকারবারের মাধ্যমে বাংলায় ভারতীয় মুদ্রা আমদানি করতে থাকে। মিলের কর্মকর্তা এমনকি ম্যানেজার পর্যন্ত এসকল কাজের সাথে যুক্ত থাকতো। ফলে পূর্ববাংলায় ব্যাপকভাবে দেশীয় মুদ্রার সংকট দেখা দেয় (*দৈনিক আজাদ*, ১৯৫০)। নগরায়ণের ফলে যে শিল্প কারখানাগুলো প্রতিষ্ঠিত হয় তাতে পূর্ববাংলায় বস্ত্র বা তাঁত শিল্পের উন্নতি হয়। কিন্তু ভারত থেকে বস্ত্র আমদানি শুরু করলে পূর্ববাংলার স্থানীয় মিলগুলোতে উৎপাদিত বস্ত্র আর প্রতিযোগিতায় টিকতে সক্ষম হয় নাই। ফলে স্থানীয় বাজারগুলোতে দেশীয় বস্ত্রের চাহিদা একেবারে কমে যায় (*দৈনিক আজাদ*, ১৯৫০)।

নগরায়ণের পাশাপাশি পরবর্তীতে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যা যেমন অপরাধ প্রবণতা, অসুস্থতা, মদ্যপান, মাদকাশক্তি, পতিতাবৃত্তি, ভিক্ষাবৃত্তি, পারিবারিক সম্পর্কের অবনতি, বেকারত্ব প্রভৃতি সমস্যা দেখা দেয়। গ্রামাঞ্চলের জনগণ কৃষিকাজ ছেড়ে চাকুরির আশায় শহরে পাড়ি জমায় যা ব্যাপকভাবে বেকারত্ব সৃষ্টি করে (রব্বানী, ২০১৯ : ৩৯)। কারণ শহরগুলোতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত থাকায় জনগণ তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী কর্ম পায় না। ফলে কর্মসংস্থানের অভাব থেকেই যায়। আবার শিক্ষার সুযোগ থাকলেও নগরগুলোতে গুণগত শিক্ষার দিক দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য লক্ষ করা যায়। ফলে লোকজন সন্তানদের সুশিক্ষিত করতে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয় (রহমান, ২০০৬ : ২৯১)।

নগরায়ণ বৃদ্ধি পেলেও বেশকিছু ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়। পূর্ববাংলার গ্রামগুলোতে পানির অভাব ছিল যথেষ্ট। বহু গ্রাম ছিল যেগুলোতে কোনো টিউবওয়েল ছিল না। ২ থেকে ৩ মাইল দূর থেকে পানি নিয়ে আসতে হতো কৃষকসহ জনসাধারণকে। কিছু কিছু টিউবওয়েল থাকলেও সেগুলো মেরামতের অভাবে ব্যবহার করা যেতো না। গ্রামে গ্রামে ওয়াটার সাপ্লাই কমিটির মাধ্যমে কিছুটা হলেও পানি সরবরাহ করা হতো। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে এই কমিটির কার্যক্রম ভেঙ্গে পড়ে এবং ব্যাহত হয় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা (*Assembly Proceedings,* 1956 : 208-209)। শহরাঞ্চলের জনগণের জন্য বিশেষ করে পানীয় জলের অভাব পূরণে ১৯৪৮ সালের বাজেটে ব্যয় করা হয়েছে ১০ লক্ষ টাকা। অথচ শহরে বসবাস করে মাত্র শতকরা ৪ জন ব্যক্তি। গ্রামের ৪ কোটি ৬০ লক্ষ জনগণের পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। অথচ পূর্ববাংলার পুলিশ খাতে বিশাল পরিমাণ অর্থ অর্থাৎ ৩,০৩,৭৭,০০০ টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে (রহমান হাসান হাফিজুর, ১৯৮২ : ৭৩।) তবে নগর সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে সরকারকে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা যায়। ১৯৪৮-৪৯ সালের দিকে স্থানীয় এলাকায় পানি সরবরাহের জন্য পরিকল্পনা এবং বেশকিছু অর্থ খরচ করার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। যেমন ঢাকা জেলায় ৪৮,৬৫২ টাকা, ময়মনসিংহে ৩৫,৬৭৮ টাকা, ফরিদপুরে ৪১,৫৬৪ টাকা, রাজশাহীতে ২২,৮৫১ টাকা, পাবনায় ২২,৫১০ টাকা, বগুড়ায় ১৬,৫৪২ টাকা, রংপুরে ২০,৫২০ টাকা, দিনাজপুরে ১৭,১০৭ টাকাসহ বিভিন্ন জেলায় আরও অনেক অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয় এই গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্পে (*Assembly Proceedings,* 1949 : 3)। ১৯৪৯ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত এই তিন বছরে গ্রামীণ অঞ্চলে পানি সরবরাহের জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

সাল	টাকা
১৯৪৯-১৯৫০	১০,৬০,০০০
১৯৫০-৫১	১১,০০,০০০
১৯৫১-৫২	১৬,০০,০০০।

(*Assembly Proceedings,* 1952 : 265.)

আর বিভিন্ন জেলায় আলাদাভাবে ব্যয় করা হয়েছে-

সাল	টাকা
১৯৪৯-১৯৫০	১০,৬৮,৪২০
১৯৫০-৫১	৯,৮৮,১৫৭
১৯৫১-৫২	১৬,১০,২০৮।

(সূত্র : *Assembly Proceedings* 1952 : 265.)

নগরায়ণ প্রক্রিয়ায় নগরগুলোতে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা এবং আধুনিকীকরণের জন্য আধুনিক পানি সরবরাহ ব্যবস্থাও অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ফলে ঢাকা নগরীতে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সরকার।

তবে এই ব্যবস্থায় সরকার পানি সরবরাহের উপর 'ওয়াটার রেট' আরোপ করেছিল। প্রথমদিকে জনগণ কর আরোপ করা নিয়ে প্রতিবাদ করলেও পরবর্তীতে আর করেনি। কারণ বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্পর্কে ততদিনে জনগণ সচেতন হয়ে উঠেছিল। ফলে পানি বিশুদ্ধ করার পুরাতন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের মাধ্যমে নগরায়ণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে মিল রেখে পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ সম্ভব হয়নি। ফলে ইনফ্লুয়েঞ্জা, কলেরা প্রভৃতি রোগে বহুলোকের মৃত্যু ঘটে। আবার পানি সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় পাইপ সীমিত থাকার কারণে নগরের অধিকাংশ লোক বিশুদ্ধ পানির ব্যবহার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ধনী ব্যক্তিদের চাহিদা মেটাতে সরকার বেশি আগ্রহী থাকায় বঞ্চিত হয়েছে নগরের সাধারণ দারিদ্র জনগোষ্ঠী। ফলে দারিদ্র এলাকাগুলোতে দূষিত পানির ব্যবহার হতে থাকে (আহমেদ, ২০০১ : ৩১১, ৩১৩-৩১৪)।

দেশভাগের পরে দারুণভাবে ভেঙ্গে পড়ে পূর্ববাংলার চিকিৎসা ব্যবস্থা। গ্রামীণ অঞ্চলের চিকিৎসা ব্যবস্থার দায়িত্ব জেলা বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকলেও প্রয়োজনীয় ঔষধ ও চিকিৎসকদের অভাবে এই বোর্ড জনসাধারণের চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করতে ব্যর্থ হয়। অর্থের সংকটের কারণে প্রয়োজনীয় ঔষধ ক্রয়ে বিলম্ব হয় যার ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে জনগণের উপর। তাই জনসাধারণের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে সরকারি পদক্ষেপ অনেক দরকার ছিল। হাসপাতালগুলোর সংখ্যা যেমন কম ছিল তেমনি এগুলোর অবস্থা খারাপ হওয়ার কারণে লোকজন হাসপাতালে আসতে চায় না। তাই গ্রামীণ এলাকায় চিকিৎসালয় স্থাপন, প্রয়োজনীয় মেডিকেল স্কুল বা কলেজ স্থাপন করে ডাক্তারদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি হয়ে পড়ে। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন লোকজন প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা পাবে তেমনি অন্যদিকে নগরায়ণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে (*Assembly Proceedings*, 1948 : 55)। তবে এক্ষেত্রে নানারকম অসঙ্গতি লক্ষ করা যায়। পূর্ববাংলার এই চিকিৎসা-শিক্ষার যথেষ্ট অভাবের পিছনে অন্যতম একটি কারণ ছিল সরকারের রিকিউজিশন নীতি। ঢাকা শহরে দুটি বেসরকারি মেডিকেল স্কুল ছিল যেখান থেকে প্রতিবছর ১০০ থেকে ২০০ ছাত্র লেখাপড়া করে বের হতো। মেডিকেল স্কুল থেকে বের হয়ে বহু ছাত্র পাশ্ববর্তী গ্রামে ডাক্তারি করেছে এবং অনেকে সুনামও অর্জন করেছে। ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল স্কুলে প্রায় ১২০০০ শিক্ষার্থী লেখাপড়া করতো। কিন্তু সরকার ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করবেন বলে এই স্কুল রিকিউজিশন বা অধিগ্রহণ করে নেয়। এমনিতে এখানে ডাক্তারের যথেষ্ট অভাব সেখানে মেডিকেল স্কুল বন্ধ করে ডাক্তারদের সংখ্যা আরও কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে বহু লোক চিকিৎসার অভাবে মারা গেছে (*Assembly Proceedings*, 1948 : 70)। ১৯৫৩ সালের এপ্রিল পর্যন্ত পাকিস্তানে মোট চিকিৎসালয় ও ঔষধালয়ের সংখ্যা ছিল মোট ১,৮৬৩টি। এর মধ্যে সরকারি, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত এবং সম্পূর্ণ বেসরকারি অর্থে পরিচালিত হাসপাতাল ও ঔষধের দোকানের সংখ্যাও অন্তর্ভূক্ত ছিল। তবে এর মধ্যে মহিলাদের জন্য ছিল মাত্র ৫৫টি চিকিৎসালয়। আর এই সমস্ত চিকিৎসালয়ের মধ্যে পূর্ববাংলায় ছিল মাত্র ৭৮৮টি (*দৈনিক আজাদ*, ১৩৬০ : ২)। ফলে আলোচ্য সময়কালে অনুন্নত যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা পূর্ববাংলার জনজীবনকে ব্যাপক প্রভাবিত করেছিল।

নগরের সম্প্রসারণ ও নগরায়ণ বৃদ্ধিতে যোগাযোগ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু পূর্ববাংলার রাস্তাঘাটের অবস্থাও ভাল ছিল না। ছোট বড় অধিকাংশ রাস্তাই ছিল অপ্রশস্ত। অলিগলির মধ্যে ময়লা অপসারণের যে ব্যবস্থা ছিল তা রক্ষণাবেক্ষণের যথেষ্ট অভাব ছিল। অব্যবস্থাপনার কারণে রাস্তার চারপাশে ময়লা আবর্জনা পড়ে থাকতো। সেখান থেকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে জনজীবনকে বিপর্যয়ে ফেলে দিতো। রাস্তার পাশের হোটেলগুলোতে অবস্থা আরও খারাপ ছিল। নতুন কিছু হোটেল ছাড়া প্রায় সবগুলোতেই খাবার খোলা অবস্থায় থাকতো যা স্বাস্থের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। ঢাকা শহরের রাস্তার চারপাশে বহু দোকানপাট স্থাপন করা হয়। নগরবাসীর চাহিদা ও রাজধানী হিসেবে ঢাকার উন্নতির জন্য এমন বহু অবকাঠামো গড়ে উঠতে থাকে। কিন্তু রাস্তার চারপাশে এমন দোকান স্থাপন

করায় নানারকম সমস্যা তৈরি হতে থাকে। এমনিতেই রাস্তার অবস্থা ভাল ছিল না এবং অধিকাংশই ছিল অপ্রশস্ত। সেখানে অপরিকল্পিতভাবে এসব দোকান নির্মাণের ফলে রাস্তার জায়গা আরও কমে গিয়েছিল (সিদ্দিকী, ২০০৪ : ২৩৭, ২৭১)। বহু মসজিদও স্থাপন করা হয়েছিল বড় বড় রাস্তার পাশে। ঢাকা শহরের অধিকাংশ মসজিদই অবস্থিত ছিল রাস্তার পাশে (ত্রিশের দশকে এমন মসজিদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩৫০ টি)। পরবর্তীতে যখন রাস্তার কাজ হবে বা রাস্তা বড় করার প্রয়োজন হবে তখন যে ধরনের জটিলতা সৃষ্টি হবে সে সম্পর্কে কোনোরকম ব্যবস্থা গ্রহণ না করেই মসজিদগুলো নির্মাণ করা হয় (আহমদ, ২০২০ : ১০১)। তাছাড়া ঢাকা শহরের রাস্তার সম্প্রসারণ ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে কর্তৃপক্ষকে তেমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা যায় নাই। রাস্তাঘাটের অবস্থা এতোটাই খারাপ হয়েছে যে সেগুলো দিয়ে চলাচলের ব্যাপক অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। আবার পানি নিষ্কাশনের যথাযথ ব্যবস্থা না থাকায় সামান্য বৃষ্টিপাতেই জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। কাঁদা জমে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়ায় রাস্তাগুলো নগরবাসীর চলাচলের অনুপযোগী হয়ে ওঠে (সিদ্দিকী, ২০০৪ : ২৭০)।

৫. উপসংহার

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, দেশভাগের পূর্ব পর্যন্ত পূর্ববাংলার নগরায়ণে তেমন কোনো গতি না থাকলেও ১৯৪৭ সালের দেশভগের পর পূর্ববাংলায় নগরায়ণের গতি বৃদ্ধি পায়। নগরায়ণের বিভিন্ন নিয়ামক যেমন বাসস্থান, শিক্ষা, যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, পানি-বিদ্যুৎ সরবরাহ, শিল্প কারখানা প্রভৃতির ক্রমোন্নতি নগরায়ণের এ গতি বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। কিন্তু নগরায়ণের হার উন্নত না থাকায় বিভাগোত্তরকালে পূর্ববাংলায় এমনকি একমাত্র বড় শহর ঢাকাতেও আধুনিক নগরায়ণের কোনো ধারা বা পরিবেশ গড়ে ওঠেনি। জনসাধারণের জীবনধারার অগ্রগতির সাথে নগরায়ণের সম্পর্ক স্থাপিত না হওয়ায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নগরবাসীর মধ্যেও আধুনিক জীবন ও নগরচেতনা লক্ষ করা যায় না। পরিকল্পিত বিনিয়োগ ও যথাযথ সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে নগরের উন্নয়নের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এ ধরনের পরিকল্পিত নগরায়ণের জন্য উন্নত পরিবেশ দেশভাগের পর পূর্ববাংলায় দেখা যায় নাই। আবার অপরিকল্পিত নগরায়ণের ফলেও বিনষ্ট হয় নগরের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ। এসব সমস্যা সমাধানে এবং সুষ্ঠু নগরায়ণে সরকারি ও বেসরকারি নীতির যথেষ্ট বাস্তবায়ন না থাকায় বার বার ব্যাহত হয়েছে পূর্ববাংলার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা যার ক্ষতিকর প্রভাব সমাজের প্রতিটি স্তরে প্রতিফলিত হয়। দ্রুত নগরায়ণ ও এর সাথে সম্পৃক্ত সমস্যাবলী সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও পূর্ববাংলার সরকার এ সম্পর্কে তেমন কোনো নীতিমালা প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়নি। সরকারের এই সুনির্দিষ্ট নীতিমালার অভাবে বিভিন্ন সময়ে ব্যাহত হয়েছে পূর্ববাংলার নগরায়ণ প্রক্রিয়া। যদিও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কাগজপত্র ও সরকারি রিপোর্টে নগরায়ণ ও নগরের উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতিমালা স্থান পেয়েছে তবে সেগুলোর বাস্তবায়নে সরকারি নীতির যথেষ্ট অভাব ছিল। যেহেতু জাতীয় উন্নয়নে এবং দেশের সার্বিক উন্নতিতে নগরায়ণের ভূমিকা অপরিহার্য তাই সকল প্রতিবন্ধকতার অবসান ঘটিয়ে দেশে নগরায়ণের উপযুক্ত নীতিমালা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র

আফরোজ, রওশন আরা (২০১৯), "বাংলায় নগরায়ণ: পরিবর্তনশীল নানা প্রসঙ্গ", *ইতিহাস প্রবন্ধমালা*, ইতিহাস একাডেমি, ঢাকা।

আহমদ, কামরুদ্দীন (২০২০), *বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

আলী, মুহম্মদ ইদ্‌রিস (১৯৯৩), "বিভাগোত্তর বাংলাদেশের জীবনপট, উপন্যাস ও ঔপন্যাসিক", মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পাদিত), *আবহমান বাংলা*, মোহাম্মদ আমিনুল হক, ঢাকা।

আহমদ, সোহেল (১৯৯৬), "গৃহ নির্মাণ খাতে অর্থায়ন ও দিনাজপুর", শরীফ উদ্দিন আহমেদ (সম্পাদিত), *দিনাজপুর : ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, ঢাকা।

আহ্মদ, কামরুদ্দীন (১৩৮৩), *পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, ইনসাইড লাইব্রেরি, ঢাকা।

আহমেদ, শরীফ উদ্দিন (২০০১), *ঢাকা: ইতিহাস ও নগর জীবন ১৮৪০-১৯২১*, একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরী, ঢাকা।

আহমেদ, শরীফ উদ্দিন (১৯৯৩), "নগরায়ণ ও নাগরিক শ্রেণী", সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪- ১৯৭১ ৩য় খন্ড সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

আহমেদ, ড. শরীফ উদ্দিন (২০১৯), "বাংলাদেশের মফস্বল শহর অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ - প্রেক্ষিত শহর দিনাজপুর", এ কে এম গোলাম রব্বানী (সম্পাদিত), *বাংলায় স্থানীয় ইহিহাস চর্চা*, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা।

ইসলাম, নজরুল (১৯৯৯), "সিলেট শহর: নগরকাঠামো এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা", শরীফ উদ্দিন আহমেদ (সম্পাদিত), *সিলেট: ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, ঢাকা।

ঘোষাল, অনিন্দিতা (২০১২), "ঢাকার অর্থনীতিতে ১৯৪৭ সালের দেশভাগের প্রভাব", শরীফ উদ্দিন আহমেদ (সম্পাদিত), *রাজধানী ঢাকার ৪০০ বছর ও উত্তরকাল*, *দ্বিতীয় খন্ড*, *অর্থনীতি ও সংস্কৃতি*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

খুদা জিনাতুন্নেসা আর.এম.এম, মাহবুব খন্দকার নিজাম উদ্দিন এ.কিউ. এম (১৯৯৬), "দিনাজপুর শহরের পারিসরিক ও আর্থ-সামাজিক বিবর্তন: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা", শরীফ উদ্দিন আহমেদ (সম্পাদিত), *দিনাজপুর: ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, ঢাকা।

ইলাহী কে. মউদুদ ও রুমী সৈয়দ রফিকুল আলম (সম্পাদিত) (২০০৫), *নগর ভূগোল সাম্প্রতিক ধারা*, ডেল্টা বুকস্, ঢাকা।

ঢাকা জেলা গেজেটিয়ার।

দাস, নিতাই (১৯৮৯), *বাংলাদেশের শিক্ষা আন্দোলন*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা।

দৈনিক আজাদ, ২৫ আশ্বিন, ১৩৫৬।

দৈনিক আজাদ, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮।

দৈনিক আজাদ, ৬ জানুয়ারি ১৯৫০।

দৈনিক আজাদ, ২৫ জুন ১৯৫৩।

দৈনিক আজাদ, ২৪ এপ্রিল ১৯৫২।

The DAWN, 4 January 1950

দৈনিক আজাদ, ৭ জুন ১৯৫০।

দৈনিক আজাদ, ৬ কার্তিক ১৩৫৭।

দৈনিক আজাদ, ২০ অক্টোবর ১৯৫৩।

দৈনিক আজাদ, ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৫০।

Pakistan Review.

দৈনিক আজাদ, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৫০।

দৈনিক আজাদ, ৯ বৈশাখ ১৩৬০।

সাপ্তাহিক পাকিস্তানী খবর।

সাপ্তাহিক মাহে-নও, প্রথম বর্ষ : প্রথম সংখ্যা, No- 1, vol- 3, এপ্রিল ১৯৫১

নগরায়ণবাংলাপিডিয়াhttp://bn.banglapedia.org/index.php/%E0%A6%A8%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6 নগরায়ণ [Accessed 16 March, 2023.]

বাহার, মোঃ হাবিবউল্লাহ্ (২০১৫), *পাকিস্তানের আঞ্চলিক বৈষম্য (১৯৪৭-১৯৬৯): পার্লামেন্টের ভাষ্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

ভূইয়া, ড. গোলাম কিবরিয়া (২০১৯), *বিশ শতকের বাংলাদেশ সমাজ রাজনীতি অর্থনীতি*, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানী, ঢাকা।

মামুন, শৈখ মোঃ মুরছালীন (২০০৪), "খুলনা নগরায়ণের বিকাশে ভূমি সমস্যার প্রভৃতি", *ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল*, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী।

মারুফা, কাজী (২০০২), *নগর ভূগোল ও নগর পরিকল্পনা*, সুজনেষু প্রকাশনী, ঢাকা।

খাতুন, মোছাঃ খোদেজা (২০২০), "পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে পাকিস্তান সরকারের শিক্ষানীতি : পূর্ব পাকিস্তানে এর প্রতিক্রিয়া", *Clio* : Jahangirnagar University Journal of the Department of History, Vol. XXXVII, June পৃ. ৭০-৭১।

রহমান, ড. মো. মাহবুবর (সম্পাদিত) (২০১২), *রাজশাহী মহানগরী : অতীত ও বর্তমান* (প্রথম খন্ড), ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

রহমান হাসান হাফিজুর (সম্পাদিত) (১৯৮২), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : প্রথম খন্ড পটভূমি (১৯০৫-১৯৫৮)*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

রহমান, আব্দুর (২০০৬), নগর পরিচিতি ও নগর পরিল্পনা, আলীগড় প্রেস এন্ড পাবলিকেসন্স, রাজশাহী।

রব্বানী, এ কে এম গোলাম (২০১২), "ঢাকার স্থানীয় সরকারের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিকাশ, ১৯৪৭-১৯৭১", আবদুল মমিন চৌধুরী শরীফ উদ্দিন আহমেদ (সম্পাদিত), *রাজধানী ঢাকার ৪০০ বছর ও উত্তরকাল প্রথম খন্ড রাজনীতি, সমাজ-প্রশাসন*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

সেন, রংগলাল (২০০৬), *বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস ও অসমতা*, পুনর্মুদ্রণ, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

সাহা, পিংকি (২০২১), "পূর্ববাংলায় দেশভাগের রাজনীতি : সাম্প্রদায়িকতা, দীর্ঘস্থায়ী অভিবাসন সংকট (১৯৪৭-১৯৬৫)", পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

সিদ্দিকী, ড. রেজোয়ান (সম্পাদিত) (২০০৪), *আজাদ ও সমকালীন সমাজ সম্পাদকীয় : ১৯৩৬-১৯৭১*, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

সিদ্দিকী, জিল্লুর রহমান (২০০০), *বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা : সংকট ও সম্ভাবনা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

রুমী, সৈয়দ রফিকুল আলম ও হক নাজনীন আফরোজ (২০০৫), "নগর পরিবহণ", কে. মউদুদ ইলাহী ও সৈয়দ রফিকুল আলম রুমী (সম্পাদিত), *নগর ভূগোল সাম্প্রতিক ধারা*, ডেল্টা বুকস্, ঢাকা।

ইসলাম, নজরুল ও বাকী, মোঃ আবদুল (সম্পাদিত) (১৯৯৬), *নগরায়ণে বাংলাদেশ*, নগর চর্চা কার্যক্রম, ঢাকা।

রহমান, আতিউর ও আজাদ, লেনিন (১৯৯০), *ভাষা-আন্দোলন : অর্থনৈতিক পটভূমি*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

বানু, মোছাঃ নাছিমা আখতার (২০১০), "বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার প্রসার : সমস্যা ও সম্ভাবনা", অপ্রকাশিত এম.ফিল অভিসন্দর্ভ, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জুন, পৃ. ১১২।

Chaudhury, Akhter Husain and Hassan, Kazi Kamrull (1999), "Urban Transformation in Secondary Towns: Study on a Khulna City Fringe", *Journal of the Institute of Bangladesh Studies*, Rajshahi.

Assembly Proceedings Official Report (1948), East Bengal Legislative Assembly, March Session, East Bengal Government Press, Dacca, 1951.

Assembly Proceedings Official Report (1948), East Bengal Legislative Assembly, Second Session, June 1948, East Bengal Government Press, Dacca, 1951.

Assembly Proceedings Official Report (1949), East Bengal Legislative Assembly, Forth Session, March 1949, East Bengal Government Press, Dacca, 1951.

Assembly Proceedings Official Report (1956), 23 September, East Pakistan Government Press, Dacca, 1957.

Assembly Proceedings Official Report (1956), East Pakistan Assembly, Third Session, 23 September 1956, East Pakistan Government Press, Dacca, 1957.

Assembly Proceedings Official Report (1952), East Bengal Legislative Assembly, Ninth Session, November 1952, East Bengal Government Press, Dacca, 1954.

Dhaka *Govt. of Pakistan*, (1968), 20 Years oF Pakistan in Statistics 1947-1967, Central statistical office, Economic Afairs Devision, Karachi.

Govt. of East Bengal (1953), Fly-Leaf of English Correspondence, Collectorate Office, Department : General, Branch : Revenue, Serial No : 88.

Islam, Nazrul (1996), *Dhaka From City to Megacity Perspectives on People, Places, Planning and Development Issues*, Urban Studies Programme, Dhaka.

The Dhaka Gazette (1953) Extraordinary, 16 June 1953, The Rajshahi University Act.

Umar, Badruddin (2004), *The Emergence of Bangladesh Class Struggle in East Pakistan (1947-1958*), Oxford University Press, Karachi, Pakistan.

[**Abstract:** The year 1947 deserves consideration as an important chapter in the history of urbanization in East Bengal. After partition, East Bengal underwent rapid urbanization due to Muslim immigrants from India and mass migration from villages to cities. In this rapid development of urbanization, development of transportation and communication system, health care facilities, employment opportunities, industrial plants, various educational institutions etc. are necessary to set up which creates problems and possibilities of urbanization. Although there are various discussions of urbanism in the historiography of East Bengal, there is no research on the role of the government in post-partition urban expansion and how urbanization affected the people of the region. Therefore, in the present article, apart from discussing the nature and pace of urbanization, the government's actions in the urbanization of East Bengal during the period 1947-1953 and its results in public life have been critically reviewed.]